ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-III, January, 2026, Page No. 697-709
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.03W.261

সন্দর্ভ নির্মাণের বিভিন্ন অঙ্গ নির্মাণ এবং গবেষণার ভাষা ও ভাষা বয়নের কৌশল: একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন

ড. বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, *সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, করিমগঞ্জ কলেজ, শ্রীভূমি, অসম, ভারত*

Received: 25.12.2025; Accepted: 10.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This chapter discusses the various dimensions involved in constructing a research framework relevant to academic inquiry. A competent researcher must remain attentive to multiple aspects throughout the research process. At the outset, it is essential to select a well-defined research topic and formulate a carefully structured title, as the entire study is built upon this foundation. Once the central theme of the research is determined, systematic analysis of the subject is undertaken, which may involve the application of diverse research methodologies and approaches.
Furthermore, the chapter emphasizes the importance of properly organizing essential components of a research paper, including the conclusion, footnotes, references, and citations. By engaging with this chapter, readers can gain a clear understanding of the fundamental rules, structure, and methodological considerations necessary for preparing a well-organized and academically sound research paper.

Keywords: Research methodology; Research framework; Topic selection; Academic writing; Data analysis; Conclusion; Citation and referencing; Research structure

১.১: গবেষণার মূল আলোচ্য বিষয়:

যে বিষয়কে কেন্দ্র করে গবেষণা করা হবে, সেটিই গবেষণার মূল আলোচ্য বিষয়। গবেষককে গবেষণার সমস্যাকে চিহ্নিত করেন এবং সমস্যাটিকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেন। গবেষকের গবেষণার বিষয়বস্তু ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে তার উপর ভিত্তি করে গবেষণার উপস্থাপন পদ্ধতিও ভিন্ন হয়। কোনো কোনো গবেষণা প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে করা হয় আবার কোনো গবেষণা গৌণ তথ্যের উপর নির্ভরশীল। এই অংশে গবেষক তথ্যের বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে উল্লেখ করেন এবং বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ করে উপসংহার তুলে ধরেন। গবেষণা কয়েকটি প্রশ্নের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে থাকে, গবেষক সেই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করেন। যে মূল বিষয়গুলিকে এই অংশে আলোচনা করা হয়, সেগুলি হল-

১। গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হল সমস্যাকে চিহ্নিত করা, ইংরেজিতে যাকে বলা হত Core Research Problem.
২। গবেষণার বিষয়বস্তু ঠিক করা এবং তার সমস্যার প্রকৃতি নির্বাচন করা।
৩। বিষয় বা সমস্যা ঠিক করার পর গবেষণা সম্পন্ন করার পরিকল্পনা তৈরি করা হয় এবং সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজে বের করা হয়।

৪। সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। তথ্যকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা হয়- প্রাথমিক তথ্য এবং গৌণ তথ্য। প্রাথমিক তথ্য বলতে বুঝায় সাক্ষাৎকার, জরিপ, পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি। প্রাথমিক তথ্য হল পূর্বে গবেষণা করা হয়েছে তার ফলফল যাচাই করা, প্রতিবেদন, বই, বিভিন্ন অনলাইন ডাটাবেজ প্রভৃতি।

৫। সঠিক প্রকল্প গঠন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোনো ঘটনার বৈজ্ঞানিক সমস্যা ও পর্যবেক্ষণের পরীক্ষালব্ধ ব্যাখ্যাই হল প্রকল্প। প্রকল্পের তথ্যগুলি নির্দিষ্ট করতে হয়, গবেষণাগারে পরীক্ষা করতে হয় এবং তা অনেক সময় পরিবর্তনশীল হয়।

৬। প্রাপ্ত তথ্যকে পরিসংখ্যানগতভাবে বা অন্যান্য নানা অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়।

৬। গবেষণার কিছু সীমাবদ্ধতাও থাকে। অনেক সময় তথ্য সংগ্রহের জন্য পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায় না, তাই সঠিক তথ্য আহরণ করা সম্ভব হয় না। আবার গবেষণা নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সমস্যা হয়।

৭। গবেষণার শেষে উপসংহার এবং ভবিষ্যতে কী করণীয় তার সুপারিশ প্রদান করা হয়।

১.২: গবেষণার পদ্ধতি বা বিশ্লেষণের গুরুত্ব:

গবেষণার সময় গবেষক যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন তাকে গবেষণা পদ্ধতি বলে। যে কোনো গবেষণায় এই অংশটি হল গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্যসমৃদ্ধ অংশ। গবেষণার যথাযথ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, সিদ্ধান্তে পৌঁছানো, উপসংহার এবং সুপারিশ প্রদান বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে করা হয়। গবেষণার সমস্যা সমাধানের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করা হয়।

১। প্রাক্-গবেষণামূলক পদ্ধতি- গবেষণা শুরুর পূর্বে তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়। গবেষণা কোন পদ্ধতির মাধ্যমে হবে তার একটি স্বচ্ছ ধারণা প্রথমেই তৈরি করতে হবে এবং গবেষণার সময় কতটা নৈতিকতা রক্ষা করা সম্ভব হবে সে বিষয়ে একটি স্থির সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

২। বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি- এই পদ্ধতির মাধ্যমে আহরিত তথ্য বা ঘটনাকে সংঘটিতভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়।

৩। পরীক্ষামূলক পদ্ধতি- এই পদ্ধতির মাধ্যমে বিকল্প প্রকল্পগুলিকে দূরে সরিয়ে রেখে স্বাধীন এবং নির্ভরশীল তথ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

৪। গুণগত পদ্ধতি- গবেষণায় এই পদ্ধতির সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়। গবেষকের অভিজ্ঞতার যথাযথ ব্যবহার এই পদ্ধতির মূলে কাজ করে। গবেষকের অভিজ্ঞতাকে এক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হলেও এটি সবেচেয়ে কার্যকরী পদ্ধতি।

৫। মূল্যায়ণ পদ্ধতি- তথ্যভিত্তিক ফলাফল প্রদান করতে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

৬। সাক্ষাৎকার পদ্ধতি- এই পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় এবং তাদের কথার ভিত্তিতে গবেষণাকে মূল রূপ দেন গবেষক।

৭। প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি- প্রচুর তথ্যের যাচাইয়ের মাধ্যম হিসেবে এই পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়। পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হয়।

১.৩: গবেষণায় উপসংহারের গুরুত্ব:

উপসংহার হল গবেষণার অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। গবেষণার মূল ফলাফল, গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যতে কী করা হবে তার একটি নির্দেশিকা এই অংশে থাকে। সমগ্র সন্দর্ভ জুড়ে গবেষণার বিভিন্ন দিক

আলোচনা করা হলেও উপসংহারে এসে আবার গবেষণার সমস্যাকে তুলে ধরা হয়। কিন্তু ভূমিকায় যেভাবে বাক্যাংশ ব্যবহার করা হয়েছে এখানে তা এড়িয়ে চলতে হবে। "উপসংহারে' বা 'পরিশেষে এসে বলতে হয় এরকম বাক্যবন্ধ ব্যবহার না করা উচিৎ না হলে গবেষণা অসম্পূর্ণ রয়েছে মনে হতে পারে। উপসংহার অংশে গবেষণার মূল বিষয়বস্তুকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়। এই অংশে গবেষণার মূল উদ্দেশ্য কী ছিল এবং তার সঙ্গে ফলাফলের গুরুত্ব কতটুকু রয়েছে তা মিলিয়ে দেখা হয়। গবেষণার কোনো সীমাবদ্ধতা ছিল কীনা তা আলোচনা করা হয় এবং ভবিষ্যতে এ নিয়ে গবেষণার সম্ভাবনা কতটুকু রয়েছে তা আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনে সুপারিশ প্রদান করা হয়।

উপসংহারের কাঠামো:

১। গবেষণার সারসংক্ষেপ (Summery of the Study)- দীর্ঘ গবেষণার একটি নাতিদীর্ঘ রূপ এখানে দেওয়া হয় যা পড়ে একজন পাঠক খুব সহজেই মূল গবেষণা সম্পর্কে একটি ধারণা করতে পারেন। গবেষণার উদ্দেশ্য, সমস্যা নিরূপণ এবং কোন পদ্ধতির মাধ্যমে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ণয় করা হয়েছে তা তুলে ধরা হয়।

২। গবেষণার ফলাফল (Key Findings)- প্রতিটি গবেষণার একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে এবং তা একটি পদ্ধতির মাধ্যমে আলোচনা করা হয়। এই অংশে গবেষণার মূল ফলাফল সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়।

৩। গবেষণার সীমাবদ্ধতা- অনেক সময় গবেষণার ক্ষেত্রে অনেক সীম্বদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন- সময়ের অভাব, তথ্য সংগ্রহের সমস্যা প্রভৃতি।

৪। ভবিষ্যৎ গবেষণার সুযোগ এবং সুপারিশ প্রদান- গবেষণার মূল ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যত গবেষণার কথা তুলে ধরা হয় এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা হয়।

১.৪: পাদটীকা (Footnotes):

ফুটনোট হলো একটি নোট বা মন্তব্য যা কোনো বই, প্রবন্ধ বা নথির নির্দিষ্ট অংশের ব্যাখ্যা, তথ্যসূত্র বা অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করতে ব্যবহার করা হয়। এটি সাধারণত পৃষ্ঠার নিচে ছোট আকারে লেখা হয় এবং মূল পাঠ্য থেকে একটি সংখ্যা বা চিহ্নের মাধ্যমে আলাদা করা হয়। ফুটনোট ব্যবহারের প্রধান উদ্দেশ্য হলো পাঠকের জন্য অতিরিক্ত তথ্য সরবরাহ করা, যাতে মূল পাঠ্য পাঠের ধারাবাহিকতা ব্যাহত না হয়।

ফুটনোটের ব্যবহার:

- তথ্যসূত্র উল্লেখ: প্রবন্ধ, গবেষণাপত্র বা বইয়ের তথ্যসূত্র প্রদান করতে।
- ব্যাখ্যা প্রদান: কোনো শব্দ, বাক্যাংশ বা বক্তব্যের ব্যাখ্যা প্রদান করতে।
- অতিরিক্ত তথ্য প্রদান: মূল পাঠ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত অতিরিক্ত তথ্য বা ইতিহাস সরবরাহ করতে।

ফুটনোট তৈরি করার পদ্ধতি:

- মূল পাঠ্যের যে অংশে ফুটনোট ব্যবহার হবে, সেখানে একটি সংখ্যা বা চিহ্ন দিতে হবে।
- পৃষ্ঠার নিচে একই সংখ্যা বা চিহ্ন দিয়ে ফুটনোট লিখতে হবে।
- প্রয়োজনীয় তথ্য, ব্যাখ্যা বা সূত্র উল্লেখ করতে হবে।

ফুটনোটের উদাহরণ:

মূল পাঠ্য: "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য রত্ন।"[১]

ফুটনোট: 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার বিজয়ী এবং 'গীতাঞ্জলি' তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ।'

১.৫: প্রান্তটীকা বা Endnote:

প্রান্তটীকা একটি উল্লেখ পদ্ধতি যা একটি গবেষণা প্রবন্ধ বা বইয়ের শেষ অংশে ব্যবহৃত হয়। এটি মূলত বিভিন্ন উৎস বা রেফারেন্সের একটি তালিকা প্রদান করে, যা পাঠককে উৎস তথ্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সুযোগ দেয়। Endnote গুলি সাধারণত প্রবন্ধের মধ্যে ব্যবহৃত নম্বরের মাধ্যমে সন্নিবেশ করা হয় এবং প্রতিটি নম্বরের জন্য প্রাসঙ্গিক উৎস তথ্য প্রদান করে।

Endnote ব্যবহার করার মূল কারণগুলো হল:

- উৎস তথ্যের সঠিক উল্লেখ নিশ্চিত করা।
- পাঠকদের উৎস সম্বন্ধে আরও তথ্য জানার সুযোগ দেওয়া।
- লেখকের কাজের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ানো।

Endnote ব্যবহার করার সময় কয়েকটি মূল বিষয় মাথায় রাখতে হয়:

- প্রতিটি উৎসের সঠিক বিবরণ প্রদান করা, যেমন: লেখক, প্রকাশনার বছর, শিরোনাম, প্রকাশক ইত্যাদি।
- লেখার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং সহজপাঠ্য হওয়া নিশ্চিত করা।
- Endnote ব্যবহার সাধারণত বিভিন্ন একাডেমিক স্টাইল গাইড অনুযায়ী হয়, যেমন APA, MLA, Chicago ইত্যাদি।

১.৬: তথ্য কী?

তথ্য শব্দের অর্থ উপাদান বা 'Data'। গবেষণা করার জন্য যে সমস্ত উপাদানের প্রয়োজন হয় সেগুলিকে তথ্য বলা হয়। প্রকৃতিগতভাবে তথ্য দুই প্রকার- গুণগত তথ্য এবং পরিমাণগত তথ্য। উৎসগতভাবেও তথ্যকে দুইভাগে করা হয়েছে- প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক তথ্য। প্রধানত লিখিত কিংবা অলিখিত উপাদান থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এটি একটি সফল গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ দিক। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করার জন্য গবেষককে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয় এবং তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। মাধ্যমিক তথ্য বিভিন্ন বই, জার্নাল, ম্যাগাজিন প্রভৃতি থেকে সংগ্রহ করা হয়। যেমন কেউ যদি লোকসাহিত্য নিয়ে গবেষণা করে তাহলে তাকে যে অঞ্চল গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু তাকে সেখানে যেতে হবে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। আবার কোনো লেখকের লেখা নিয়ে গবেষণা করলে গবেষককে মাঠে যেতে হয় না, মাধ্যমিক তথ্যের উপর নির্ভর করেই গবেষণা করতে পারেন।

১.৭: তথ্যসূত্র কী?

তথ্যসূত্র হলো একটি গবেষণা, প্রবন্ধ বা যেকোনো ধরনের লেখার মধ্যে ব্যবহৃত উৎস বা রেফারেন্স যা লেখক তার কাজের জন্য তথ্য বা ধারণা সংগ্রহ করতে ব্যবহার করেন। তথ্যসূত্র প্রদান করার মাধ্যমে পাঠককে জানানো হয় কোন কোন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সেই উৎসগুলির সঠিক অবস্থান। তথ্যসূত্র প্রদানের মাধ্যমে লেখার গুণগত মান বৃদ্ধি পায় এবং গবেষণার ভিত্তি দৃঢ় হয়। এটি লেখক এবং পাঠকের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন তৈরি করে, যা গবেষণার স্বচ্ছতা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সততা বজায় রাখতে সাহায্য করে। তথ্যসূত্র প্রদান করা একটি গুরুত্বপূর্ণ একাডেমিক চর্চা, যা প্রতিটি গবেষক এবং লেখকের মেনে চলা উচিত। এটি লেখার গুণগত মান বৃদ্ধি করে, পাঠকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে এবং লেখকের সততা বজায় রাখে। অতএব, প্রতিটি গবেষক এবং লেখকের উচিত তথ্যসূত্রের সঠিক ব্যবহার এবং মেনে চলা।

১.৮: তথ্যসূত্রের গুরুত্ব:

১. বিশ্বাসযোগ্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি: তথ্যসূত্র ব্যবহারের মাধ্যমে একটি লেখা বা গবেষণার বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। এটি দেখায় যে লেখক তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্ভরযোগ্য এবং প্রামাণিক উৎস ব্যবহার করেছেন।

২. পাঠকের জন্য তথ্য প্রাপ্তির সুবিধা: তথ্যসূত্র প্রদান করলে পাঠকরা মূল উৎসের বিস্তারিত তথ্য পেতে পারেন এবং চাইলে সেই উৎসগুলি পড়ে আরও গভীরে যেতে পারেন। এটি পাঠকদের জন্য গবেষণা এবং যাচাই করার সুযোগ প্রদান করে।

৩. চুরি প্রতিরোধ (প্লেজিয়ারিজম): তথ্যসূত্র প্রদান করলে এটি স্পষ্ট হয় যে কোন ধারণা বা তথ্যটি লেখকের নিজস্ব এবং কোনটি অন্যদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে। এটি চুরি প্রতিরোধ করে এবং লেখকের কাজের মৌলিকত্ব বজায় রাখে।

৪. মূল উৎসের প্রতি সম্মান প্রদর্শন: তথ্যসূত্র ব্যবহার করে লেখক মূল উৎস এবং তাদের লেখকদের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করেন। এটি একটি সম্মানজনক পদ্ধতি যা গবেষণা এবং লেখালেখির মধ্যে প্রচলিত।

৫. বুদ্ধিবৃত্তিক সততা রক্ষা: তথ্যসূত্র প্রদান করা বুদ্ধিবৃত্তিক সততার একটি অংশ। এটি দেখায় যে লেখক যথাযথভাবে তাদের গবেষণার ভিত্তি এবং উৎসগুলি চিহ্নিত করেছেন।

৬. গবেষণার ধারাবাহিকতা ও প্রাসঙ্গিকতা নিশ্চিতকরণ: তথ্যসূত্র প্রদান করে গবেষকরা দেখাতে পারেন যে তাদের কাজ পূর্ববর্তী গবেষণার সাথে সম্পর্কিত এবং তারা বর্তমান গবেষণার ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন।

৭. তথ্য অনুসন্ধানের সুযোগ: তথ্যসূত্র ব্যবহার করে পাঠকরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আরও তথ্য খুঁজে পেতে পারেন। এটি একটি গবেষণা পদ্ধতির অংশ যা শিক্ষার্থী এবং গবেষকদের আরও উন্নত গবেষণা করার সুযোগ প্রদান করে।

১.৯: তথ্যের প্রকারভেদ:

বিভিন্ন ভিত্তিতে তথ্যের প্রকারভেদ করা যেতে পারে। সাধারণত তথ্যকে উৎস, প্রকৃতি, গুণগত মান এবং ব্যবহারযোগ্যতার ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। নিচে তথ্যের প্রধান প্রকারভেদগুলি আলোচনা করা হলো:

১. উৎসের ভিত্তিতে তথ্যের প্রকারভেদ-

- প্রাথমিক তথ্য (Primary Data): প্রাথমিক তথ্য সরাসরি উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়। উদাহরণ: সমীক্ষা, সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষামূলক তথ্য।
- মাধ্যমিক তথ্য (Secondary Data): মাধ্যমিক তথ্য পূর্বে সংগৃহীত এবং প্রকাশিত উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়। এটি প্রাথমিকভাবে অন্য কেউ সংগ্রহ করেছে এবং গবেষক তা ব্যবহার করেন। উদাহরণ: বই, জার্নাল, সরকারি প্রতিবেদন, ইন্টারনেটের তথ্য।

২. প্রকৃতির ভিত্তিতে তথ্যের প্রকারভেদ-

- গুণগত তথ্য (Qualitative Data): গুণগত তথ্য হলো অ-সংখ্যাগত তথ্য যা গুণগত বৈশিষ্ট্য এবং বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে। এটি সাধারণত বর্ণনামূলক হয়। উদাহরণ: সাক্ষাৎকারের প্রতিক্রিয়া, ব্যক্তিগত মতামত, বিশ্লেষণাত্মক বিবরণ।
- পরিমাণগত তথ্য (Quantitative Data): পরিমাণগত তথ্য হলো সংখ্যাগত তথ্য যা পরিমাপযোগ্য এবং পরিসংখ্যানের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা যায়। উদাহরণ: ভোটের সংখ্যা, বিক্রয়ের পরিমাণ, পরীক্ষার স্কোর।

৩. গুণগত মানের ভিত্তিতে তথ্যের প্রকারভেদ-

- ক্রমাগত তথ্য (Continuous Data): ক্রমাগত তথ্য হলো এমন তথ্য যা একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে যে কোনো মান গ্রহণ করতে পারে। উদাহরণ: ওজন, উচ্চতা, তাপমাত্রা।
- বিচ্ছিন্ন তথ্য (Discrete Data): বিচ্ছিন্ন তথ্য হলো এমন তথ্য যা শুধুমাত্র নির্দিষ্ট মান গ্রহণ করতে পারে এবং ভগ্নাংশ বা দশমিক সংখ্যা হিসাবে প্রকাশ করা যায় না। উদাহরণ: জনসংখ্যা, গাড়ির সংখ্যা, পরীক্ষার নম্বর।

৪. ব্যবহারযোগ্যতার ভিত্তিতে তথ্যের প্রকারভেদ-

- মৌলিক তথ্য (Raw Data): মৌলিক তথ্য হলো প্রাথমিকভাবে সংগৃহীত এবং কোন প্রক্রিয়াজাতকরণ বা বিশ্লেষণ ছাড়াই তথ্য। উদাহরণ: সমীক্ষার অপরিবর্তিত প্রতিক্রিয়া, পরীক্ষার অপরিবর্তিত ফলাফল।
- প্রক্রিয়াজাত তথ্য (Processed Data): প্রক্রিয়াজাত তথ্য হলো বিশ্লেষণ, পরিসংখ্যান এবং বিভিন্ন তথ্যপ্রক্রিয়াকরণ কৌশল ব্যবহার করে পরিবর্তিত এবং বিশ্লেষিত তথ্য। উদাহরণ: উপস্থাপিত পরিসংখ্যান, চার্ট এবং গ্রাফ।

৫. তথ্যের উৎসের ভিত্তিতে প্রকারভেদ-

- প্রাথমিক তথ্য (Primary Sources): এটি প্রথমবার সংগ্রহ করা তথ্য যা গবেষক নিজে সংগ্রহ করেন। উদাহরণ: সাক্ষাৎকার, ময়দান জরিপ।
- মাধ্যমিক তথ্য (Secondary Sources): পূর্বে সংগৃহীত এবং প্রকাশিত তথ্য যা গবেষক গবেষণার জন্য ব্যবহার করেন। উদাহরণ: সরকারী প্রতিবেদন, গবেষণাপত্র, বই।

৬. তথ্যের রূপের ভিত্তিতে প্রকারভেদ-

- পাঠ্য তথ্য (Textual Data): এটি লেখার আকারে তথ্য যা বাক্য বা শব্দের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। উদাহরণ: প্রতিবেদন, প্রবন্ধ।
- সংখ্যাগত তথ্য (Numerical Data): এটি সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য যা গাণিতিক বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ: জনসংখ্যার পরিসংখ্যান, বিক্রির সংখ্যা।

তথ্যসূত্র প্রদান করার কয়েকটি সাধারণ নির্দেশিকা:

১. লেখকের নাম: লেখকের শেষ নাম এবং পরে প্রথম নাম। বইয়ের নাম।
২. প্রকাশের তারিখ: উৎসটির প্রকাশের সঠিক তারিখ প্রদান করা।
৩. শিরোনাম: বই, প্রবন্ধ, বা ওয়েবসাইটের শিরোনাম সঠিকভাবে উল্লেখ করা।
৪. প্রকাশক বা উৎস: প্রকাশকের নাম বা ওয়েবসাইটের নাম উল্লেখ করা।
৫. পৃষ্ঠা নম্বর: বিশেষ করে সরাসরি উক্তি বা নির্দিষ্ট তথ্যের ক্ষেত্রে পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করা।

১.১০: প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি:

প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিগুলি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে এবং এগুলি মূলত গবেষণা, সমীক্ষা, বা তদন্তের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন:

a. সাক্ষাৎকার (Interviews):

- ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার: নির্দিষ্ট প্রশ্নের ভিত্তিতে একজন ব্যক্তির সাথে সরাসরি আলাপচারিতা।
- গোষ্ঠী সাক্ষাৎকার: একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে একটি গোষ্ঠীর সাথে আলোচনা করা।

b. পর্যবেক্ষণ (Observation):

- প্রকৃত পর্যবেক্ষণ: গবেষক সরাসরি ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন।
- অপ্রকৃত পর্যবেক্ষণ: গবেষক দূর থেকে বা কোনও মিডিয়ার সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করেন।

c. সমীক্ষা (Surveys):

- প্রশ্নমালা (Questionnaires): একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ।
- অনলাইন সমীক্ষা (Online Surveys): ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রশ্নমালা পাঠিয়ে তথ্য সংগ্রহ।

d. ফোকাস গ্রুপ (Focus Groups):

- নির্দিষ্ট একটি বিষয় নিয়ে একটি ছোট গোষ্ঠীর মধ্যে আলোচনা এবং মতামত সংগ্রহ।

e. পরীক্ষা (Experiments):

- নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বিভিন্ন ভেরিয়েবলগুলির উপর পরীক্ষা করে তথ্য সংগ্রহ।

f. ক্ষেত্র গবেষণা (Field Research):

- প্রাকৃতিক বা বাস্তবিক পরিবেশে গবেষণা করা এবং সরাসরি তথ্য সংগ্রহ।

g. ডায়রি বা লগ রাখা (Keeping Diaries or Logs): নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন বিষয়ে ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ বা কার্যক্রম লিখে রাখা।

h. সাম্প্রতিক ঘটনা বা অভিজ্ঞতা থেকে তথ্য সংগ্রহ (Collecting Data from Recent Events or Experiences): সাম্প্রতিক কোন ঘটনা বা অভিজ্ঞতা থেকে সরাসরি তথ্য সংগ্রহ।

তথ্যসূত্র প্রদানের পদ্ধতি:

তথ্যসূত্র প্রদানের সর্বসম্মতিক্রমে কোনো পদ্ধতি স্বীকৃত না হলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তা বিভিন্নভাবে প্রয়োগ হয়। তথ্যসূত্র ব্যবহার করার জন্য বর্তমানে অনেকগুলি রেফারেন্স স্টাইল প্রচলিত আছে। কিছু জনপ্রিয় স্টাইলের মধ্যে রয়েছে এপিএ (APA), এমএলএ (MLA), শিকাগো (Chicago), হার্ভার্ড (Harvard) ইত্যাদি। তবে বর্তমানে এপিএ এবং এমএলএ স্টাইল সর্বত্র অনুসরণ করা হয়। সমাজ বিজ্ঞানের (Social Science) বিষয়গুলির জন্য এপিএ এবং মানবিকীবিদ্যার (Humanities) জন্য এমএলএ বর্তমানে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। নিচে কয়েকটি প্রধান পদ্ধতির উদাহরণ দেওয়া হলো:

১.১১: এপিএ (APA) রেফারেন্স স্টাইল:

এপিএ (APA) রেফারেন্স স্টাইল হলো একটি জনপ্রিয় সাইটেশন স্টাইল যা আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (American Psychological Association) দ্বারা প্রণীত। এটি সাধারণত সামাজিক বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, শিক্ষা, এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের একাডেমিক লেখালেখির জন্য ব্যবহৃত হয়। APA স্টাইলের প্রধান উদ্দেশ্য হলো গবেষণাপত্রের তথ্যসূত্র প্রদান এবং সঠিক সাইটেশন নিশ্চিত করা। APA রেফারেন্স স্টাইল ব্যবহার সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো:

মৌলিক বিধি:

১. ইন-টেক্সট সাইটেশন (In-text Citation): ইন-টেক্সট সাইটেশন লেখার সময়, লেখকের নাম এবং প্রকাশের বছর ব্যবহার করা হয়। প্রয়োজনে পৃষ্ঠার নম্বরও যোগ করা হয়। যেমন-

- একক লেখকের জন্য: আচার্য দেবেশ কুমার, ২০২০/আচার্য দেবেশ কুমার, ২০২০, পৃষ্ঠা: ৪৫
- দুইজন লেখকের জন্য: আচার্য দেবেশ কুমার এবং বন্দ্যোপাধ্যায় অসিত কুমার, ২০২০/আচার্য দেবেশ কুমার, এবং বন্দ্যোপাধ্যায় অসিত কুমার, ২০২০ পৃষ্ঠা: ৪৫

- তিন বা তার অধিক লেখকের জন্য:

  প্রথম সাইটেশনে সব লেখকের নাম: আচার্য দেবেশ কুমার, বন্দ্যোপাধ্যায় অসিত কুমার এবং সেন সুকুমার, ২০২০

  পরবর্তী সাইটেশনে প্রথম লেখক 'এবং অন্যান্য' (et al.): আচার্য দেবেশ কুমার এবং অন্যান্য, ২০২০

বইয়ের রেফারেন্স:

- ফরম্যাট: লেখকের শেষ নাম, প্রথম নামের প্রথম অক্ষর। (প্রকাশের বছর) । বইয়ের শিরোনাম। প্রকাশকের নাম।

উদাহরণ:

Smith, J. A. (2020). The Great Adventure. Penguin Books.

আচার্য, দে. কু. (২০২০), বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। ইউনাইটেড বুক এজেন্সি।

প্রবন্ধ বা নিবন্ধের রেফারেন্স:

- ফরম্যাট: লেখকের শেষ নাম, প্রথম নামের প্রথম অক্ষর। (প্রকাশের বছর) । প্রবন্ধের শিরোনাম। জার্নালের শিরোনাম, খণ্ড সংখ্যা (ইস্যু সংখ্যা), পৃষ্ঠা নম্বর।

উদাহরণ:

Doe, J. (2019). Modern architecture. Journal of Contemporary Design, 5(2), 45-60.

নাথ, প্রি। (২০১৪) গুণময় মান্নার 'মুটে': সত্যের আলোকসন্ধানী। প্রতিধ্বনি দ্য ইকো, ২(৩), ২৫-৩১

ওয়েবসাইটের রেফারেন্স:

- ফরম্যাট: লেখকের শেষ নাম, প্রথম নামের প্রথম অক্ষর। (প্রকাশের বছর, মাস দিন) । ওয়েবপেজের শিরোনাম। ওয়েবসাইটের নাম। URL

উদাহরণ:

Smith, J. (2021, March 15). The future of renewable energy. Green Energy Solutions. https://www.greenenergysolutions.com/future-renewable

ভট্টাচার্য, অ। (২০২১, ৬ জুন)। ঘাটু গান। ই-লার্নিং ইনফো। https://www.elearninginfo.in/ghatu-gan.php

বইয়ের অধ্যায় বা অংশের রেফারেন্স:

- ফরম্যাট: লেখকের শেষ নাম, প্রথম নামের প্রথম অক্ষর। (প্রকাশের বছর)। অধ্যায় বা অংশের শিরোনাম। সম্পাদকের নাম (সম্পাদক), বইয়ের শিরোনাম (পৃষ্ঠা নম্বর)। প্রকাশকের নাম।

উদাহরণ:

Brown, E. (2018). Cultural influences on art. In M. Johnson (Ed.), Art and society (pp. 120-135). Oxford University Press.

পাল, শ্রাবণী। (২০১৮)। শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড। সম্পাদিত, মজুমদার উজ্জ্বলকুমার, গল্পচর্চা। পৃষ্ঠা ১৫৪-১৫৭)। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।

এপিএ স্টাইলের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা:

১. **ডাবল-স্পেসিং:** পুরো গবেষণাপত্র এবং রেফারেন্স লিস্টে ডাবল-স্পেসিং ব্যবহার করতে হবে।

২. **মার্জিন:** সমস্ত প্রান্ত থেকে ১ ইঞ্চি মার্জিন রাখা।

৩. **ফন্ট:** পাঠযোগ্য ফন্ট, সাধারণত Times New Roman, ১২ পয়েন্ট সাইজ। বাংলার ক্ষেত্রে বেনসেন ফন্ট, ১৪ সাইজ রাখা যেতে পারে বা অন্যান্য বাংলা ফন্ট ব্যবহার করা যেতে পারে। ফন্ট এর উপর নির্ভর করে সাইজ ১২ কিংবা ১৪ করা যেতে পারে।

৪. **প্যারাগ্রাফ ইন্ডেন্ট:** প্রতিটি নতুন প্যারাগ্রাফের শুরুতে ০.৫ ইঞ্চি ইন্ডেন্ট রাখা।

৫. **রেফারেন্স লিস্ট বিন্যাস:** 'References' বা তথ্যসূত্র যেখানে ব্যবহার হবে সেখানে পৃষ্ঠার উপরে কেন্দ্রীয়ভাবে শিরোনাম দিতে হবে।

৬. **আলফাবেটিকাল অর্ডার:** সমস্ত এন্ট্রি লেখকের শেষ নামের ভিত্তিতে আলফাবেটিক্যাল অর্ডারে সাজাতে হবে।

৭. **হ্যাংগিং ইন্ডেন্ট:** প্রতিটি এন্ট্রির দ্বিতীয় এবং পরবর্তী লাইনে ০.৫ ইঞ্চি হ্যাংগিং ইন্ডেন্ট রাখতে হবে।

১.১২: এমএলএ (MLA) স্টাইল:

এমএলএ (MLA) স্টাইল হলো একটি জনপ্রিয় রেফারেন্স এবং সাইটেশন স্টাইল, যা সাধারণত ভাষা, সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক গবেষণার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এটি 'মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাসোসিয়েশন' (Modern Language Association) দ্বারা প্রণীত। এমএলএ স্টাইলের মূল উদ্দেশ্য হলো একক একটি মান অনুযায়ী তথ্যসূত্র প্রদান করা যাতে লেখার শৃঙ্খলা ও পাঠযোগ্যতা বজায় থাকে। নিচে এমএলএ রেফারেন্স স্টাইল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

মৌলিক বিধি:

১. ইন-টেক্সট সাইটেশন (In-text Citation):

- ইন-টেক্সট সাইটেশনে লেখকের নাম এবং পৃষ্ঠার নম্বর ব্যবহার করা হয়। উদাহরণ:
  একক লেখকের জন্য: (Smith 45)/ দেবেশ কুমার, পৃষ্ঠা: ৪৫
  একাধিক লেখকের জন্য: (Smith and Johnson 45)/ দেবেশ কুমার, এবং অসিত কুমার, পৃষ্ঠা: ৪৫

উদাহরণ: "লেখার মধ্যে সরাসরি উক্তি": "নতুন প্রযুক্তির প্রভাব উল্লেখযোগ্য' (Smith 45)/ দেবেশ কুমার, পৃষ্ঠা: ৪৫ ।

প্যারাফ্রেজ বা সারমর্ম: Smith/দেবেশ কুমার জানিয়েছেন যে নতুন প্রযুক্তির প্রভাব উল্লেখযোগ্য (45)।

২. ওয়ার্কস সাইটেড (Works Cited) পৃষ্ঠা: ওয়ার্কস সাইটেড পৃষ্ঠা হলো সেই পৃষ্ঠা যেখানে সকল রেফারেন্সের সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হয়।

- **বইয়ের রেফারেন্স**
  ফরম্যাট: লেখকের শেষ নাম, প্রথম নাম। বইয়ের শিরোনাম। প্রকাশকের নাম, প্রকাশের বছর।
  উদাহরণ: Smith, John. The Great Adventure. Penguin Books, 2020.
  আচার্য, দেবেশ কুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, ২০২০।

প্রবন্ধ বা নিবন্ধের রেফারেন্স:

- ফরম্যাট: লেখকের শেষ নাম, প্রথম নাম। 'প্রবন্ধের শিরোনাম'। জার্নালের শিরোনাম, খণ্ড সংখ্যা, সংখ্যা, প্রকাশের বছর, পৃষ্ঠাসমূহ।

উদাহরণ:

Doe, Jane. 'Modern Architecture'. Journal of Contemporary Design, vol. 5, no. 2, 2019, pp. 45-60.

নাথ, প্রিয়কান্ত, গুণময় মান্নার 'মুটে': সত্যের আলোকসন্ধানী, প্রতিধ্বনি দ্য ইকো, খণ্ড ২ সংখ্যা ৩, ২০১৪, পৃষ্ঠা ২৫-৩১

ওয়েবসাইটের রেফারেন্স:

- ফরম্যাট: লেখকের শেষ নাম, প্রথম নাম। ওয়েবপেজের শিরোনাম। ওয়েবসাইটের নাম, প্রকাশকের নাম (যদি ভিন্ন হয়), প্রকাশের তারিখ, URL।

উদাহরণ:

Smith, John. "The Future of Renewable Energy'. Green Energy Solutions, 15 Mar. 2021, www.greenenergysolutions.com/future-renewable.

ভট্টাচার্য, অপরাজিতা, ঘাটু গান, ই-লার্নিং ইনফো, ৬ জুন, ২০২১, https://www.elearninginfo.in/ghatu-gan.php

বইয়ের অধ্যায় বা অংশের রেফারেন্স:

- ফরম্যাট: লেখকের শেষ নাম, প্রথম নাম। অধ্যায় বা অংশের শিরোনাম। বইয়ের শিরোনাম, সম্পাদক(দের) নাম, প্রকাশকের নাম, প্রকাশের বছর, পৃষ্ঠা নম্বর।

উদাহরণ:

Brown, Emily. 'Cultural Influences on Art'. Art and Society, edited by Mark Johnson, Oxford University Press, 2018, pp. 120-135.

পাল, শ্রাবণী, শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড, গল্পচর্চা, সম্পাদক, মজুমদার উজ্জ্বলকুমার, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৮, পৃষ্ঠা ১৫৪-১৫৭।

এমএলএ স্টাইলের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা:

- ডাবল-স্পেসিং: পুরো গবেষণাপত্র এবং ওয়ার্কস সাইটেড পৃষ্ঠা ডাবল-স্পেসিং হতে হবে।
- মার্জিন: সকল প্রান্ত থেকে ১ ইঞ্চি মার্জিন রাখতে হবে।
- ফন্ট: পাঠযোগ্য ফন্ট, সাধারণত Times New Roman, ১২ পয়েন্ট সাইজ। বাংলার ক্ষেত্রে বেনসেন ফন্ট, ১৪ সাইজ রাখা যেতে পারে বা অন্যান্য বাংলা ফন্ট ব্যবহার করা যেতে পারে। ফন্ট এর উপর নির্ভর করে সাইজ ১২ কিংবা ১৪ করা যেতে পারে।
- প্যারাগ্রাফ ইন্ডেন্ট: প্রতিটি নতুন প্যারাগ্রাফের শুরুতে ০.৫ ইঞ্চি ইন্ডেন্ট রাখতে হবে।
- ওয়ার্কস সাইটেড পৃষ্ঠা বিন্যাস: Works Cited পৃষ্ঠার উপরে কেন্দ্রীয়ভাবে শিরোনাম দিতে হবে।
- আলফাবেটিকাল অর্ডার: সমস্ত এন্ট্রি লেখকের শেষ নামের ভিত্তিতে আলফাবেটিক্যাল অর্ডারে সাজাতে হবে।
- হ্যাংগিং ইন্ডেন্ট: প্রতিটি এন্ট্রির দ্বিতীয় এবং পরবর্তী লাইনে ০.৫ ইঞ্চি হ্যাংগিং ইন্ডেন্ট রাখতে হবে।

১.১৩: হার্ভার্ড (Harvard) স্টাইল:

- বইয়ের জন্য: লেখকের নাম, প্রকাশের বছর, বইয়ের শিরোনাম, প্রকাশনের স্থান, প্রকাশকের নাম।
  উদাহরণ: Smith, J.A., 2020. The Great Adventure. New York: Penguin Books.
- জার্নাল নিবন্ধের জন্য: লেখকের নাম, প্রকাশের বছর, নিবন্ধের শিরোনাম, জার্নালের নাম, খণ্ড সংখ্যা (ইস্যু সংখ্যা), পৃষ্ঠা সংখ্যা।

উদাহরণ: Doe, J., 2019. Modern architecture. Journal of Contemporary Design, 5(2), pp. 45-60.

- ওয়েবসাইটের জন্য: লেখকের নাম, প্রকাশের তারিখ, ওয়েবপেজের শিরোনাম, ওয়েবসাইটের নাম, URL।

উদাহরণ:
Smith, J., 2021. The future of renewable energy. Green Energy Solutions. Available at: https://www.greenenergysolutions.com/future-renewable [Accessed 15 March 2021]

১.১৪: গ্রন্থপঞ্জি লেখার স্টাইল:

সংজ্ঞা: গ্রন্থে বা গবেষণাপত্রে ব্যবহৃত তথ্য বা উপাদানগুলির উৎস নির্দেশকে গ্রন্থপঞ্জি বলে। গ্রন্থপঞ্জি লেখার স্টাইল বিভিন্ন অ্যাকাডেমিক এবং পেশাগত ক্ষেত্রে বিভিন্নরকম হতে পারে। কিছু জনপ্রিয় স্টাইলের মধ্যে রয়েছে এপিএ (APA), এমএলএ (MLA), শিকাগো (Chicago), হার্ভার্ড (Harvard) ইত্যাদি। প্রতিটি স্টাইলের নিজস্ব নিয়মাবলী এবং ফরম্যাট রয়েছে। নিচে এই স্টাইলগুলির উদাহরণসহ সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো:

এপিএ (APA) স্টাইল:

- বইয়ের জন্য: লেখকের নাম, প্রকাশের বছর, বইয়ের শিরোনাম, প্রকাশকের নাম।

  উদাহরণ:

  Smith, J. A. (2020). The great adventure. Penguin Books.
- জার্নাল নিবন্ধের জন্য: লেখকের নাম, প্রকাশের বছর, নিবন্ধের শিরোনাম, জার্নালের নাম, খণ্ড সংখ্যা (ইস্যু সংখ্যা), পৃষ্ঠা সংখ্যা।

  উদাহরণ:

  Doe, J. (2019). Modern architecture. Journal of Contemporary Design, 5(2), 45-60.
- ওয়েবসাইটের জন্য: লেখকের নাম, প্রকাশের তারিখ, ওয়েবপেজের শিরোনাম, ওয়েবসাইটের নাম, URL।

  উদাহরণ:

  Smith, J. (2021, March 15). The future of renewable energy. Green Energy Solutions. https://www.greenenergysolutions.com/future-renewable

এমএলএ (MLA) স্টাইল:

- বইয়ের জন্য: লেখকের নাম, বইয়ের শিরোনাম, প্রকাশকের নাম, প্রকাশের বছর।

  উদাহরণ:

  Smith, John. The Great Adventure. Penguin Books, 2020
- জার্নাল নিবন্ধের জন্য: লেখকের নাম, নিবন্ধের শিরোনাম, জার্নালের নাম, খণ্ড সংখ্যা, ইস্যু সংখ্যা, বছর, পৃষ্ঠা সংখ্যা।

  উদাহরণ:

  Doe, John. "Modern Architecture." Journal of Contemporary Design, vol. 5, no. 2, 2019, pp. 45-60.
- ওয়েবসাইটের জন্য: লেখকের নাম, ওয়েবপেজের শিরোনাম, ওয়েবসাইটের নাম, প্রকাশকের নাম, প্রকাশের তারিখ, URL।

  উদাহরণ: Smith, John. "The Future of Renewable Energy." Green Energy Solutions, 15 March 2021, https://www.greenenergysolutions.com/future-renewable.

শিকাগো (Chicago) স্টাইল:

- বইয়ের জন্য: লেখকের নাম, বইয়ের শিরোনাম, প্রকাশনের স্থান: প্রকাশকের নাম, প্রকাশের বছর। উদাহরণ: Smith, John. The Great Adventure. New York: Penguin Books, 2020.

গ্রন্থপঞ্জি তৈরির মূল উদ্দেশ্য:

গ্রন্থপঞ্জি বা বর্ণানুক্রমিক তালিকা তৈরির মূল উদ্দেশ্য হলো পাঠকদেরকে নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে তথ্যসূত্র বা উৎস সম্পর্কে সঠিক ও বিস্তারিত ধারণা প্রদান করা। এটি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে তৈরি হতে পারে, যেমন:

- **তথ্যসূত্র প্রদান:** কোনো গবেষণা পত্র, প্রবন্ধ বা বইয়ে ব্যবহৃত তথ্যসূত্রের তালিকা প্রদানের মাধ্যমে পাঠককে সেই তথ্যের উৎস সম্পর্কে জানানো।
- **পাঠকদের সাহায্য করা:** পাঠকদের সেই বিষয় সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে সাহায্য করা এবং তাদেরকে আরও পড়াশোনা বা গবেষণা করার উৎসাহ প্রদান করা।
- **মূল্যায়ন ও যাচাই:** পাঠক এবং গবেষকরা সেই তথ্যসূত্র যাচাই করে তার সত্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা মূল্যায়ন করতে পারে।
- **স্বীকৃতি প্রদান:** যেসব লেখক, গবেষক বা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, তাদের যথাযোগ্য স্বীকৃতি প্রদান করা।
- **সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা:** পাঠ্যপুস্তক, প্রবন্ধ বা গবেষণা পত্রের তথ্যগুলি সংগঠিত এবং সুসংহতভাবে প্রদর্শনের জন্য।
- **পুনরায় ব্যবহার:** ভবিষ্যতে একই বিষয়ে গবেষণা বা লেখার জন্য তথ্যসূত্রগুলি সহজে খুঁজে পাওয়া।

গ্রন্থপঞ্জি বিভিন্ন ধরণের হতে পারে- যেমন প্রাথমিক গ্রন্থপঞ্জি (যেখানে মৌলিক তথ্যসূত্র দেয়া হয়) এবং গৌণ গ্রন্থপঞ্জি (যেখানে প্রাথমিক তথ্যসূত্রের উপর ভিত্তি করে তথ্য প্রদান করা হয়)।

১.১৫: গবেষণার ভাষা:

গবেষণার ভাষা বলতে সেই শৈলী, কাঠামো এবং শব্দচয়নকে বোঝানো হয়, যা একাডেমিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ব্যবহৃত হয়। ভাষা স্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত, প্রমাণভিত্তিক এবং আনুষ্ঠানিক হতে হয়, যাতে গবেষণার মূল বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়। গবেষণার ভাষার কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন:

১। গবেষণার ভাষা অবশ্যই আনুষ্ঠানিক এবং গাম্ভীর্যপূর্ণ হওয়া উচিত।

২। আনুষ্ঠানিক ভাষার ব্যবহার করা উচি্ত। প্রচলিত দৈনন্দিন ভাষার পরিবর্তে একাডেমিক ভাষা ব্যবহার করা উচিত। যেমন অনেক ক্ষেত্রে ‘আমরা দেখেছি’ এধরনের বাক্যবন্ধ ব্যবহার করি। এটির পরিবর্তে ‘গবেষণায় দেখা যায়’ এ ধরনের শব্দবন্ধ ব্যবহার করা উচিত।

৩। গবেষণার ভাষা স্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত হবে।

৪। ভাষা পরিষ্কার ও সহজবোধ্য হতে হবে। অপ্রয়োজনীয় শব্দ পরিহার করা উচিত।

৫। ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে গবেষকের নিরপেক্ষ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা প্রয়োজন। এখানে আবেগের কোনো জায়গা নেই, ভাষা হবে যৌক্তিক ও তথ্যনির্ভর।

৬। অনেক সময় ‘আমি মনে করি’ বা ‘আমার মতে’ এ সমস্ত বাক্য আমরা ব্যবহার করি। কিন্তু এ ধরনের বাক্য ব্যবহার করা ঠিক নয়। তার পরিবর্তে ‘উপাত্ত অনুসারে বোঝা যায়’ কিংবা ‘ গবেষণার ফলাফল নির্দেশ করে’ এ ধরনের বাক্য ব্যবহার করা উচিত।

৭। গবেষণায় উল্লেখিত প্রতিটি বক্তব্য তথ্যনির্ভর ও সঠিক সূত্রসহ তুলে ধরতে হয়। কোনো ধরনের অনুমানের উপর নির্ভর করে বা ব্যক্তিগত মতামত বর্জন করতে হবে।

৮। সুনির্দিষ্ট পরিভাষা এবং সঠিক শব্দচয়ন করতে হবে।

৯। নির্ভুল ব্যাকরণ এবং বাক্য গঠন করতে হবে।

গ্রন্থপঞ্জি:

১। আচার্য, দেবেশ কুমার। ব্যবহারিক বাংলা ও সাহিত্য গবেষণার পদ্ধতিবিজ্ঞান, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ ২০১৯-২০।

২। শইকীয়া, নগেন। গবেষণা পদ্ধতি পরিচয়, কৌস্তুভ প্রকাশন, নতুন বাজার, ডিব্রুগড় ১, প্রথম প্রকাশ ২০০৫।

৩। সরকার, পবিত্র। গবেষণা ও গবেষণা পদ্ধতির সহজ পাঠ, বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, আচার্য গিরীশ চন্দ্র বোস কলেজ, কলকাতা, ৭০০০০০৯।

৪। গবেষণা পদ্ধতি বিজ্ঞান, পাঠ সহায়ক উপাদান, এম. এ তৃতীয় সেমিস্টার, মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, নদীয়া ৭৪১২৩৫।

৫। Pandey, Dr. Prabhat & Dr. Meenu Mishra Pandey. Research Methodology: Tools and Techniques, Bridge Center 2015, Buzau, Al. Marghiloman 245 bis, 120082.